বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

(গতকালের পর)

<u>লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার</u> : ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে স্মরণীয়। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ভারতীয়দের কাছে তিনি বিভিন্নভাবে সমালোচিতও হয়েছেন। তবে এ উপমহাদেশে তার শিক্ষা সংস্কার নানাভাবে প্রশংসনীয়। লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রতিটি প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করেন। এক পক্ষকালব্যাপী আলাপ-আলোচনা শেষে ১৬০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড কার্জন তার শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি করেন। কার্জনের সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার ও ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলো এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা সংস্কারের যত চেষ্টাই করেছিলেন তাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এদেশের শিক্ষা উন্নয়নে তার আন্তরিকতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা ধারার সূত্রপাত ঘটে তারই শাসনকালে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী।

<u>স্যাডলার কমিশন</u> : প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯১৯ সালে শেষ দিকে এ রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ কমিশনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও বলা হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট পাঁচ খণ্ডে শেষ করা হয়েছে এবং আট খণ্ডে এর পরিশিষ্ট রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার এবং পরিকল্পনার জন্য এ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনসহ আরও অনেক সুপারিশ করেছেন।

স্যাডলার কমিশন ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা বলে বিবেচিত করেন। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যায়ন আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক নেই যা এ কমিশন আলোচনা করেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করে কমিশন গঠন করা হলেও ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে।

(আগামীকাল সমাপ্ত)

<u>সার্জেন্ট কমিশন</u> : ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে দার্শনিকতা ও সংকীর্ণমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে ছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ। তার খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল-বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহ প্রণীত হয়েছে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদান সার্জেন্ট পরিকল্পনা থেকে নেয়া হয়েছিল।

<u>পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন</u> : ভারত ভাগের পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী করাচীতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়া স্কুল ও কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সামরিক প্রশিক্ষণ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন, কারিগরি শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠান ও নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

<u>ক) মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ শিক্ষা কমিশন</u> : ১৯৪৯ সালে ১৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন" নামে পরিচিত কমিটির প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি ১৯৫২ সালে তার সুপারিশ মালা তদানীন্তন সরকারের কাছে পেশ করে। এই সব সুপারিশ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, নারী, সংখ্যা লঘু, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

<u>খ) আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন</u> : আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এই কমিশন মূলত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার জন্য গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রথম সভা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে ব্রিটিশ আমলের সকল সুপারিশ পর্যালোচনা করে। তাছাড়া, এ কমিশন ১৯৫২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের গুণগত মান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি।

<u>গ) শরীফ ও হামুদুর রহমান কমিশন</u> :

সংবিধানে সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য একই মানসম্পন্ন গণমুখী এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ২৪ অক্টোবর কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বিধানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল এ কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করে। ১৯৭৩ সালে ৮ জুন কমিশন তাদের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। প্রায় ৪০০ জন সদস্যসংবলিত ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির বিস্তৃত কাজের মাধ্যমে এই কমিশন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে কমিশন ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এটা একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল হিসেবে বিবেচিত। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার বাস্তব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সকল সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষায় অর্থ সংস্থানের তথ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ উৎসের সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি, এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী এই শিক্ষা দলিলটিকে জনগণের মধ্যে আর প্রচার করেনি। তবে বর্তমান সরকার কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষা কমিশন গঠন করে অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিশন (১৯৭৯) : ১৯৭৮ সালে ৫ আগস্ট এক সরকারি আদেশ বলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট এক জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে ২০ সেপ্টেম্বর অন্য এক আদেশ বলে আরও ৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি- ক) একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে আও সমস্যাবলী সম্পর্কে সাধারণভাবে সরকারকে অবহিত রাখা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আ.ন. শরফুদ্দিন পরিষদ সচিবালয়ে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। উক্ত পরিষদ দীর্ঘ ছয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) : ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির

৬ এপ্রিল ২০০৯ ইং সনে বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয়। কো-চেয়ারম্যা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও সদস্য সচি করা হয় অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবিরকে। উ শিক্ষা নীতিতে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ জ এবং দুটি সংযোজনীসহ আটাশটি অধ্যায় ও ত্রিশ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। শিক্ষা প্রত্যেকটি স্তর নিখুঁতভাবে আলোচনা করে সমস সমাধানের পথ বের করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে বিজ্ঞান, কারিগ ও ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আটা সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাত্র চা মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতাম গ্রহণের জন্য ওয়েব সাইট এবং অন্যান্য প্রচা মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সা পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচ পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার আলোচনা সভা করে সমাজের সকল স্তরে মানুষের সমমত নির্বিশেষে মতামত নেয়া হয়। এ শিক্ষানীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে ক হয়েছে। ১) এটা কোন দলীয় শিক্ষানীতি না জনগণ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতী শিক্ষানীতি, ২) শিক্ষানীতি কোন অপরিবর্তনী বিষয় নয়। এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ স সময় উন্মুক্ত থাকবে। কোন ভুল, ত্রুটি হলে তা স সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশী বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রে সব সময় এর পরিবর্তন, বা আধুনিকীকর অব্যাহত থাকবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধা বর্ণিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন যেখা প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিক নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে। সেটিও বিবেচন নেয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানে নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষ সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত বিজ্ঞানমনস্ক এ মানসম্মত শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থা গ তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে

<u>উপসংহার</u> : পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধা আসতে পারি যে, ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু ক পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে যতগুলো শি কমিশন বা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সবগুলো কমিশন শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষক শিক্ষার্থী সমস্যা এবং তার সমাধান, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার বিস্তারিত সুপারিশ প্রদান করেছেন। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের চিন্তা, চেতনা এবং তাদের স্বার্থ আগে হাসিল করা। ভারতীয়দের উন্নয়নে এখানে মুখ্য ব্যাপার ছিল না। তবে প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছে। এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সরকারিকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা